দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

21

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ সম্প্রতি জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। কিন্তু ক্যাম্পাসে কতিপয় সন্ত্রাসীর উপস্থিতির দরুন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আমরা অবশ্যই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার পক্ষপাতী। তবে আমাদের ধারণা, জনমত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ সন্ত্রাস অপছন্দ করে। সন্ত্রাসকে তারা ভয় পায়, ঘৃণা করে। কারণ, সন্ত্রাস তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে বাধা। সাধারণ মানুষ তাদের সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চায়। লেখাপড়া করতে গিয়ে সন্ত্রাসের শিকার হয়ে তাদের সন্তানরা লাশ হয়ে যাক এটা তারা চাইতে পারে না। আমরা জানি, সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরাও সন্ত্রাস চান না। তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলেন, মিছিল করেন। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই কথা বলেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তারাও সন্ত্রাসবিরোধী। তাহলে সন্ত্রাস কে চায়? কেউ না। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়, সন্ত্রাসমূলক ঘটনা তবু কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব হয় না। আমরা সবাই সন্ত্রাসবিরোধী। তাহলে সন্ত্রাসী কে?

কিছুদিন আগে সংঘটিত জিন্নাহ হত্যাকান্ডের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি বেশ কিছুদিন শান্ত ছিল। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছিল। পরীক্ষা চলছিল। এর ফলে সবার মনে এমন একটা আশা জাগছিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু না। সে দুরাশা। সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় সব্ সরঞ্জামই যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে মওজুদ ছিল তা ঘটনার সময়ে টের পাওয়া গেল। হত্যাকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র সবই সময়মত বেরিয়ে এল। এসব কোথায় ছিল, কখন এল–এসব প্রশ্নের জবাব কে দেবে? পুলিশ দু এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং হলগুলিতে তল্লাশি চালায়। মাঝে মাঝে কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়। কিন্তু সব হয় না একথার প্রমাণ তো আছেই। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা কি রকম হওয়া উচিত সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। আনুষ্ঠানিক না হয়ে বোধহয় তাদের আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হলগুলিতে অছাত্র প্রবেশ করে, অবস্থান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষকরাও ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব টেনে আনেন আমরা জানি। শুধু রাজনীতিই অবশ্য ক্যাম্পাসে দ্বন্দ্বের একমাত্র উৎস নয়। চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, টাকা–পয়সার ভাগ–বাঁটোয়ারা এসব নিয়েও মারামারি–খুনোখুনি হচ্ছে। ঘটনা যাই হোক, এ বিষয়গুলি যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাঞ্ছিত নয়, এ ব্যাপারে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একমত হবেন নিশ্চয়। শুধু শিক্ষাঙ্গনে নয়, গোটা সমাজের জন্যই এরকম ঘটনা অশুভ প্রতিক্রিয়া ছড়াচ্ছে। অথচ এর শেষ কোথায় কেউ বলতে পারছে না। এ পরিস্থিতি অস্বস্তিকর সন্দেহ নেই।

আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ উভয় পক্ষকেই আরো সক্রিয় এবং কঠোর হতে হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত আছে। প্রয়োজনে জনমত গঠনের কাজ অব্যাহত রাখা যাবে। কিন্তু সন্ত্রাস প্রতিরোধের বাস্তব পরিস্থিতির ওপর জোর দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানতে হবে ক্যাম্পাসে কোথায় কি ঘটনা ঘটছে। কারা ক্যাম্পাসে আসা–যাওয়া করে, কি উদ্দেশ্যে করে। কখনইবা ক্যাম্পাসে অস্ত্র আসে। তাদের সহযোগিতায় পুলিশকে আরো দক্ষ ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষাঙ্গন তথা সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতেই হবে। একটা জাতির অগ্রযাত্রার পথ মসৃণ করার জন্য এ কাজ জরুরী।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, সকল অনুষদের ডীন, প্রভোস্ট, সিন্ডিকেট সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার, সময় স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন যে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, তাদের বহিষ্কার করা হলেও সরকার কোন নমনীয়তা প্রদর্শন করবে না। সরকারের এই আশ্বাসের পর বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ নীরব থাকতে পারেন না।

SHEETS